কুরাইশ

১০৬

নামকরণ

প্রথম আয়াতের কুরাইশ (قُرَيْشٍ) শব্দটিকে সূরার নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

যাহ্হাক ও কাল্বী একে মাদানী বললেও মুফাস্সিরগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ দল এর মক্কী হবার ব্যাপারে একমত। তাছাড়া এ সরার শব্দাবলীর মধ্যেও এর মক্কী হবার সুস্পষ্ট প্রমাণ নিহিত রয়েছে। যেমন رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ (এ ঘরের রব)। এ সূরাটি মদীনায় নাযিল হলে কাবাঘরের-জন্য "এ ঘর" শব্দ দু'টি কেমন করে উপযোগী হতে পারে? বরং সূরা আল ফীলের বিষয়বস্তুর সাথে এর এত গভীর সম্পর্ক রয়েছে যে, সম্ভবত আল ফীল নাযিল হবার পর পরই এ সূরাটি নাযিল হয়ে থাকবে বলে মনে হয়। উভয় সূরার মধ্যে এই গভীর সম্পর্ক ও সামঞ্জস্যের কারণে প্রথম যুগের কোন কোন মনীষী এ দু'টি সূরাকে মূলত একটি সূরা হবার মত পোষণ করতেন। হযরত উবাই ইবনে কাব (রা) তাঁর সংকলিত কুরআনের অনুলিপিতে এ দু'টি সূরাকে একসাথে লিখেছেন এবং সেখানে এ দু'য়ের মাঝখানে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লেখা ছিল না। এ ধরনের রেওয়ায়াত পূর্বোক্ত চিন্তাকে আরো শক্তিশালী করেছে। তাছাড়া হযরত উমর (রা) একবার কোন ভেদ চিহ্ন ছাড়াই এই সূরা দু'টি এক সাথে নামাযে পড়েছিলেন। কিন্তু এ রায় গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সাইয়েদুনা হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বিপুল সংখ্যক সাহাবায়ে কেরামের সহযোগিতায় সরকারীভাবে কুরআন মজীদের যে অনুলিপি তৈরি করে ইসলামী দুনিয়ার বিভিন্ন কেন্দ্রে পাঠিয়েছিলেন তাতে এ উভয় সূরার মাঝখানে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লেখা ছিল। তখন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত সারা দুনিয়ার সমস্ত কুরআন মজীদ এ দু'টি আলাদা আলাদা সূরা হিসেবেই লিখিত হয়ে আসছে। এ ছাড়াও এ সূরা দু'টির বর্ণনা ভংগী পরস্পর থেকে এত বেশী বিভিন্ন যে, এ দু'টির ভিন্ন ভিন্ন সূরা হবার ব্যাপারটি একেবারে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ঐতিহাসিক পটভূমি

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রপিতামহ কুসাই ইবনে কিলাবের সময় পর্যন্ত কুরাইশ গোত্র হিজাযে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় বসবাস করছিল। কুসাই সর্বপ্রথম তাদেরকে মক্কায় একত্র করে। এভাবে বাইতুল্লাহর মুতাওয়াল্লীর দায়িত্ব তাদের হাতে আসে। এ জন্য কুসাইকে "মুজাম্মে" বা একত্রকারী উপাধি দান করা হয়। এ ব্যক্তি নিজের উন্নত পর্যায়ের বুদ্ধিবৃত্তিক কুশলতা ও ব্যবস্থাপনার সাহায্যে মক্কায় একটি নগর রাষ্ট্রের বুনিয়াদ স্থাপন করে। আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত হাজীদের খেদমতের উত্তম ব্যবস্থা করে। এর ফলে ধীরে ধীরে আরবের সকল গোত্রের মধ্যে এবং সমস্ত এলাকায় কুরাইশদের প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। কুসাইয়ের পর তার পুত্র আবদে মান্নাফ ও আবদুদ্দারের

মধ্যে মক্কা রাষ্ট্রের শাসন কর্তৃত্ব বিভক্ত হয়ে যায়। কিন্তু দুই ভাইয়ের মধ্যে পিতার আমলেই আবদে মান্নাফ অধিকতর খ্যাতি লাভ করে এবং সমগ্র আরবে তার মর্যাদা স্বীকৃতি লাভ করতে থাকে। আবৃদে মান্নাফের ছিল চার ছেলে ঃ হাশেম, আবৃদে শামস, মুত্তালিব ও নওফাল। এদের মধ্য থেকে আবদুল মুত্তালিবের পিতা ও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রপিতামহ হাশেমের মনে সর্বপ্রথম আরবের পথে প্রাচ্য এলাকার দেশসমূহ এবং সিরিয়া ও মিসরের মধ্যে যে আন্তরজাতিক বাণিজ্য চলতো তাতে অংশগ্রহণ করার এবং এই সংগে আরববাসীদের জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রও কিনে আনার চিন্তা জাগে। তার ধারণামতে এভাবে বাণিজ্য পথের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গোত্ররা তাদের কাছ থেকে দ্রব্য–সামগ্রী কিনবে এবং মক্কার বাজারসমূহে দেশের অভ্যন্তরের ব্যবসায়ীরা সামগ্রী কেনার জন্য ভিড় জমাবে। এটা এমন এক সময়ের কথা যখন উত্তরাঞ্চলের দেশসমূহ ও পারস্য উপসাগরের পথে রোম সাম্রাজ্য ও প্রাচ্য দেশসমূহের মধ্যে যে আন্তরজাতিক বাণিজ্য চলতো তার ওপর ইরানের সাসানীয় সম্রাটরা পুরোপুরি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এ কারণে দক্ষিণ আরব থেকে লোহিত সাগরের উপকূল ঘেঁসে সিরিয়া ও মিসরের দিকে প্রসারিত বাণিজ্য পথে ব্যবসা বিপুলভাবে জমে উঠেছিল। আরবের অন্যান্য বাণিজ্য কাফেলার তুলনায় কুরাইশদের বাড়তি সুবিধা ছিল। কাবার খাদেম হবার কারণে পথের সমস্ত গোত্র তাদেরকে মর্যাদার চোখে দেখতো। হজ্জের সময় কুরাইশ বংশীয় লোকেরা যে আন্তরিকতা, উদারতা ও বদান্যতা সহকারে হাজীদের খেদমত করতো সে জন্য সবাই তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল। কাজেই কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলার ওপর পথে ডাকাতদের আক্রমণ হবে এ আশংকা ছিল না। পথের বিভিন্ন গোত্র অন্যান্য বাণিজ্য কাফেলার কাছ থেকে যে বিপুল পরিমাণ পথকর আদায় করতো তাও তাদের কাছ থেকে আদায় করতে পারতো না। এসব দিক বিবেচনা করে হাশেম একটি বাণিজ্য পরিকল্পনা তৈরি করে এবং এই পরিকল্পনায় তার অন্য তিন ভাইকেও শামিল করে। হাশেম সিরিয়ার গাস্সানী বাদশাহ থেকে, আবৃদে শামস হাবশার বাদশাহর থেকে, মুত্তালিব ইয়ামনের গভর্ণরদের থেকে এবং নওফল ইরাক ও পারস্যের সরকারদের থেকে বাণিজ্যের সুযোগ–সুবিধা লাভ করে। এভাবে তাদের ব্যবসা দ্রুত উন্নতি লাভ করতে থাকে। ফলে তারা চার ভাই "মুত্তাজিরীন" বা সওদাগর নামে খ্যাত হয়। আর এই সংগে তারা আশপাশে গোত্রদের ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে যে সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল সে জন্য তাদেরকে "আসহাবুল ঈলাফ" তথা প্রীতির সম্পর্ক সৃষ্টিকারী বলা হতো।

এ ব্যবসার কারণে কুরাইশবংশীয় লোকেরা সিরিয়া, মিসর, ইরান, ইয়ামন ও হাবশার সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার সুযোগ লাভ করে। সরাসরি বিভিন্ন দেশের সমাজ, সংস্কৃতি, সভ্যতার সংস্পর্শে আসার কারণে তাদের দেখার, জানার ও উপলব্ধি করার মান অনেক উন্নত হতে থাকে। ফলে আরবের দ্বিতীয় কোন গোত্র তাদের সমপর্যায়ে পৌঁছতে পারেনি। ধন–সম্পদের দিক দিয়েও তারা আরবের সবচেয়ে উঁচু পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। মক্কা পরিণত হয়েছিল সমগ্র আরব উপদ্বীপের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা কেন্দ্রে। এ আন্তরজাতিক সম্পর্কের একটি বড় সুফল হিসেবে তারা ইরাক থেকে বর্ণমালাও আমদানী করে। পরবর্তী কালে কুরআন মজীদ লেখার জন্য এ বর্ণমালাই ব্যবহৃত হয়। আরবের কোন গোত্রে কুরাইশদের মতো এত বেশী লেখাপড়া জানা লোক ছিল না। এসব কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন ঃ قُرَيْشٌ قَادَةُ النَّاسِ

অর্থাৎ কুরাইশরা হচ্ছে জনগণের নেতা। (মুসনাদে আহমাদ ঃ আমর ইবনুল আস (রা) বর্ণিত হাদীস সমষ্টি) বাইহাকী হযরত আলীর (রা) রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

كَانَ هٰذَا الْاَمْرُ فِىْ حِمْيَرَ فَنَزَعَهُ اللّٰهُ مِنْهُمْ وَجَعَلَهُ فِى قُرَيْشٍ

"প্রথমে আরবদের নেতৃত্ব ছিল হিময়ারী গোত্রের দখলে তারপর মহান আল্লাহ তা তাদের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে কুরাইশদেরকে দান করেন।"

কুরাইশরা এভাবে একের পর এক উন্নতির মনযিল অতিক্রম করে চলছিল। এমন সময় আবরাহার মক্কা আক্রমণের ঘটনা ঘটে। যদি সে সময় আবরাহা কা'বা ভেঙ্গে ফেলতে সক্ষম হতো তাহলে আরবদেশে শুধু মাত্র কুরাইশদেরই নয়, কা'বা শরীফের মর্যাদাও খতম হয়ে যেতো। এটি যে সত্যিই বাইতুল্লাহ বা আল্লাহর ঘর, জাহেলী যুগের আরবদের এই বিশ্বাসের ভিত্ও নড়ে উঠতো। এ ঘরের খাদেম হিসেবে সারা দেশে কুরাইশদের যে মর্যাদা ও প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল তাও মুহূর্তের মধ্যে ধূলিসাৎ হয়ে যেতো। হাবশীদের মক্কা দখল করার পর রোম সম্রাট সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে সিরিয়া ও মক্কার মাঝখানের বাণিজ্য পথও দখল করে নিতো। ফলে কুসাই ইবনে কিলাবের আগে কুরাইশরা যে দুর্গত অবস্থার শিকার ছিল তার চাইতেও মারাত্মক দুরবস্থার মধ্যে তারা পড়তো। কিন্তু মহান আল্লাহ তাঁর অসীম কুদরতের খেলা দেখান। পক্ষীবাহিনী পাথর মেরে মেরে আবরাহার ৬০ হাজারের বিশাল হাবশীবাহিনীকে ধ্বংস করে দেয়। মক্কা থেকে ইয়ামন পর্যন্ত সারাটা পথে বিধ্বস্ত সেনাবাহিনীর লোকেরা পড়ে মরে যেতে থাকে। এ সময় কা'বা শরীফের আল্লাহর ঘর হবার ব্যাপারে সমস্ত আরববাসীর ঈমান আগের চাইতে কয়েকগুণ বেশী মজবুত হয়ে যায়। এই সংগে সারা দেশে কুরাইশদের প্রতিপত্তি আগের চাইতেও আরো অনেক বেশী প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন আরবদের মনে বিশ্বাস জন্মে, এদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ বর্ষিত হয়। ফলে এরা নির্বিঘ্নে আরবের যে কোন অংশে যেতো এবং নিজেদের বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে যে কোন এলাকা অতিক্রম করতো। এদের গায়ে হাত দেবার সাহস কারো হতো না। এদের গায়ে হাত দেয়া তো দূরের কথা এদের নিরাপত্তার ছত্রছায়ায় কোন অকুরাইশী থাকলেও তাকে কেউ বিরক্ত করতো না।

মূল বক্তব্য

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবকালে যেহেতু এ অবস্থা সবার জানা ছিল তাই এসব কথা আলোচনা করার প্রয়োজন ছিল না। এ কারণে এ ছোট্ট সূরাটিতে চারটি বাক্যের মধ্য দিয়ে কুরাইশদেরকে কেবলমাত্র এতটুকু কথা বলাই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে যে, যখন তোমরা নিজেরাই এ ঘরটিকে (কাবা ঘর) দেবমূর্তির মন্দির নয় বরং আল্লাহর ঘর বলে মনে করো এবং যখন তোমরা ভালোভাবেই জানো যে, আল্লাহই তোমাদেরকে এ ঘরের বদৌলতে এ পর্যায়ের শান্তি ও নিরাপত্তা দান করেছেন, তোমাদের ব্যবসায় এহেন উন্নতি দান করেছেন এবং অভাব–অনাহার থেকে রক্ষা করে তোমাদেরকে এ ধরনের সমৃদ্ধি দান করেছেন তখন তোমাদের তো আসলে তাঁরই ইবাদাত করা উচিত।

لِاِيۡلٰفِ قُرَيۡشٍ ۙ﴿۱﴾ اٖلٰفِهِمۡ رِحۡلَةَ الشِّتَآءِ وَ الصَّيۡفِ ۚ﴿۲﴾ فَلۡيَعۡبُدُوۡا رَبَّ هٰذَا الۡبَيۡتِ ۙ﴿۳﴾ الَّذِيۡۤ اَطۡعَمَهُمۡ مِّنۡ جُوۡعٍ ۬ۙ وَّ اٰمَنَهُمۡ مِّنۡ خَوۡفٍ ﴿۴﴾

যেহেতু কুরাইশরা অভ্যস্ত হয়েছে,[১] (অর্থাৎ) শীতের ও গ্রীষ্মের সফরে অভ্যস্ত।[২] কাজেই তাদের এই ঘরের রবের ইবাদাত করা উচিত,[৩] যিনি তাদেরকে ক্ষুধা থেকে রেহাই দিয়ে খাবার দিয়েছেন[৪] এবং ভীতি থেকে নিরাপত্তা দান করেছেন।[৫]

১. মূল শব্দ হচ্ছে لِاِيۡلٰفِ قُرَيۡشٍ । এখানে ঈলাফ (ايلاف) শব্দটি এসেছে উলফাত (الفت) শব্দ থেকে। এর অর্থ হয় অভ্যস্ত হওয়া, পরিচিত হওয়া, বিচ্ছেদের পর মিলিত হওয়া এবং কোন জিনিসের অভ্যাস গড়ে তোলা। ঈলাফ শব্দের পূর্বে যে 'লাম'টি ব্যবহৃত হয়েছে সে সম্পর্কে অনেক আরবী ভাষাবিদ পণ্ডিত এ মত প্রকাশ করেছেন যে, আরবী প্রচলন ও বাকরীতি অনুযায়ী এর মাধ্যমে বিস্ময় প্রকাশ করা বুঝায়। যেমন আরবরা বলে, لِزَيۡدٍ وَمَا صَنَعۡنَا بِهٖ "এই যায়েদের ব্যাপারটা দেখো, আমরা তার সাথে ভালো ব্যবহার করলাম কিন্তু সে আমাদের সাথে কেমন ব্যবহারটা করলো!" কাজেই لِاِيۡلٰفِ قُرَيۡشٍ মানে হচ্ছে, কুরাইশদের ব্যবহারে বড়ই অবাক হতে হয়। কেননা আল্লাহর অনুগ্রহে তারা বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হবার পর একত্র হয়েছে এবং এমন ধরনের বাণিজ্য সফরে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে যা তাদের প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধির মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। অথচ তারা সেই আল্লাহর বন্দেগী করতে অস্বীকার করছে! ভাষাতত্ত্ববিদ আখ্‌ফশ, কিসাঈ ও ফাররা এ মত ব্যক্ত করেছেন। ইবনে জারীর এ মতকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে লিখেছেন, আরবরা যখন এ 'লাম' ব্যবহার করে কোন কথা বলে তখন সেই কথাটি এ বিষয়টি প্রকাশ করার জন্য যথেষ্ট বিবেচিত হয় যে, একথার পরও যে ব্যক্তি কোন আচরণ করে তা বিস্ময়কর। বিপরীতপক্ষে খলীল ইবনে আহমদ, সিবওয়াইহে ও যামাখ্‌শারী প্রমুখ ভাষাতত্ত্ব ও অলংকার শাস্ত্রবিদগণ বলেন, এখানে লাম অব্যয় সূচক এবং এর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে আগের বাক্য فَلۡيَعۡبُدُوۡا رَبَّ هٰذَا الۡبَيۡتِ এর সাথে। এর অর্থ হচ্ছে, এমনিতেই তো কুরাইশদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামত সীমা–সংখ্যাহীন, কিন্তু অন্য কোন নিয়ামতের ভিত্তিতে না হলেও আল্লাহর অনুগ্রহের কারণে তারা এই বাণিজ্য সফরে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে, অন্তত এই একটি নিয়ামতের কারণে তাদের আল্লাহর বন্দেগী করা উচিত। কারণ এটা মূলত তাদের প্রতি একটা বিরাট অনুগ্রহ।

২. শীত ও গ্রীষ্মের সফরের মানে হচ্ছে গ্রীষ্মকালে কুরাইশরা সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের দিকে বাণিজ্য সফর করতো। কারণ এ দু'টি শীত প্রধান দেশ। আর শীতকালে সফর করতো দক্ষিণ আরবের দিকে। কারণ সেটি গ্রীষ্ম প্রধান এলাকা।

৩. এ ঘর মানে কা'বা শরীফ। এখানে আল্লাহর বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে, এ ঘরের বদৌলতেই কুরাইশরা এই নিয়ামতের অধিকারী হয়েছে। তারা নিজেরাই একথা মেনে নিয়েছে যে, এই যে ৩৬০টি মূর্তিকে তারা পূজা করে এরা এ ঘরের রব নয়। বরং একমাত্র আল্লাহই এর রব। তিনিই আসহাবে ফীলের আক্রমণ থেকে তাদেরকে বাঁচিয়েছেন। আবরাহার সেনাবাহিনীর মোকাবিলায় সাহায্য করার জন্য তাঁর কাছেই তারা আবেদন জানিয়েছিল। তাঁর ঘরের আশ্রয় লাভ করার আগে যখন তারা আরবের চারদিকে ছড়িয়ে ছিল তখন তাদের কোন মর্যাদাই ছিল না। আরবের অন্যান্য গোত্রের ন্যায় তারাও একটি বংশধারার বিক্ষিপ্ত দল ছিল মাত্র। কিন্তু মক্কায় এই ঘরের চারদিকে একত্র হবার এবং এর সেবকের দায়িত্ব পালন করতে থাকার পর সমগ্র আরবে তারা মর্যাদাশালী হয়ে উঠেছে। সবদিকে তাদের বাণিজ্য কাফেলা নির্ভয়ে যাওয়া আসা করছে। কাজেই তারা যা কিছুই লাভ করেছে এ ঘরের রবের বদৌলতেই লাভ করেছে। কাজেই তাদের একমাত্র সেই রবেরই ইবাদাত করা উচিত।

৪. মক্কায় আসার পূর্বে কুরাইশরা যখন আরবের চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল তখন তারা অনাহারে মরতে বসেছিল। এখানে আসার পর তাদের জন্য রিযিকের দরজাগুলো খুলে যেতে থাকে। তাদের সপক্ষে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এই বলে দোয়া করেছিলেন—'হে আল্লাহ! আমি তোমার মর্যাদাশালী ঘরের কাছে একটি পানি ও শস্যহীন উপত্যকায় আমার সন্তানদের একটি অংশের বসতি স্থাপন করিয়েছি, যাতে তারা নামায কায়েম করতে পারে। কাজেই তুমি লোকদের হৃদয়কে তাদের অনুরাগী করে দিয়ো, তাদের খাবার জন্য ফলমূল দান করো।' (সূরা ইবরাহীম ৩৭) তাঁর এই দোয়া অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়।

৫. অর্থাৎ যে ভীতি থেকে আরব দেশে কেউ নিরাপদ নয়, তা থেকে তারা নিরাপদ রয়েছে। সে যুগে আরবের অবস্থা এমন ছিল যে, সারা দেশে এমন কোন জনপদ ছিল না যেখানে লোকেরা রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারতো। কারণ সবসময় তারা আশংকা করতো, এই বুঝি কোন লুটেরা দল রাতের অন্ধকারে হঠাৎ তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং তাদের সবকিছু লুট করে নিয়ে গেলো। নিজের গোত্রের সীমানার বাইরে পা রাখার সাহস কোন ব্যক্তির ছিল না। কারণ একাকী কোন ব্যক্তির জীবিত ফিরে আসা অথবা গ্রেফতার হয়ে গোলামে পরিণত হবার হাত থেকে বেঁচে যাওয়া যেন অসম্ভব ব্যাপার ছিল। কোন কাফেলা নিশ্চিন্তে সফর করতে পারতো না। কারণ পথে বিভিন্ন স্থানে তার ওপর ছিল দস্যু দলের আক্রমণের ভয়। ফলে পথ-পার্শ্বের প্রভাবশালী গোত্র সরদারদেরকে ঘুষ দিয়ে দিয়ে বাণিজ্য কাফেলাগুলো দস্যু ও লুটেরাদের হাত থেকে নিজেদেরকে নিরাপদ রেখে এগিয়ে যেতে পারতো। কিন্তু কুরাইশরা মক্কায় সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিল। তাদের নিজেদের ওপর কোন শত্রুর আক্রমণের ভয় ছিল না। তাদের ছোট বড় সব রকমের কাফেলা দেশের প্রত্যেক এলাকায় যাওয়া আসা করতো। হারাম শরীফের খাদেমদের কাফেলা, একথা জানারপর কেউ তাদের ওপর আক্রমণ করার সাহস করতো না। এমন কি একজন কুরাইশী একাই যদি কখনো কোন জায়গায় যেতো এবং সেখানে কেউ তার ক্ষতি করতে যেতো তাহলে তার পক্ষে শুধুমাত্র হারমী (حرمى) বা أنا من حرم الله আমি হারম শরীফের লোক বলে দেয়াই যথেষ্ট ছিল। একথা শুনার সাথে সাথেই আক্রমণকারীর হাত নিচের দিকে নেমে আসতো।